# মল্লিনাথের সঙ্গে তর্কাতর্কি

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়ের কবুলনামা একের পর এক পোশাক খুলে ফেলায় এখন উদোম, প্রেমপ্রমাদের ধর্ষণ আছে সুদ বাবদ, আর যত লাভালাভ সমস্তই ধ্বংসবীজ— মৃতের মতো মুক্ত এখন…

১.১.৯৫। স্থান : কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস। সময় : দুপুর। লোকজন কম, আড্ডাস্থলটি তাই কোলাহলমুক্ত। উল্টে একটা ঘুমঘুমভাব, টেবিল-চেয়ারের বস্তুময়তা, নিজস্বগন্ধ, আয়তন ও আকার-সহ এমন এক ক্ষুদ্র অথচ সম্পূর্ণ বিশ্ব রচনা করে রেখেছিল যে তার আবহে ডুবে মনে হচ্ছিল এর বাইরে কিছু নেই। সেইসময় হাতে ধরা পেঙ্গুইন বুক অফ ফ্রেঞ্চ ভার্স ফোর-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটি পংক্তি পড়ে ফেলি। শুরুর অনুচ্ছেদটি ঠিক সেই পংক্তিটি নয়। বিন্দুর পর বিন্দুতে গড়ে তোলা অক্ষর, অক্ষরে অক্ষরে শব্দ, শব্দমালায় যে প্রকাশ ছিল, পড়তে পড়তেই তারা দুর্বোধ্য হচ্ছিল, বিন্দুতে ফিরে যাচ্ছিল। এইরকম চলতে থাকলেও কিছু শব্দ মাথায় গেঁথে গেল, উত্তেজিত লাগছিল, ওই শব্দরা এখানকার পরিবেশ ও আমার

ফাঁকা মাথাটি ( মড়ার খুলি ) নিয়ে এমন গেণ্ডুয়া খেল শুরু করল যা বলবার নয়। পেণ্গুইন পুস্তকটি ইংরেজিতে রচিত, সেখানকার ওই পংক্তিটিতে 'কনফেসন' শব্দটি ছিল, আমাদের সংস্কৃতিতে কনফেসন নেই। কনফেসন কনফেসন— বিড়বিড় করতে-করতে নিরর্থক ও বেড়ে আনন্দে বেঁচে থাকা এই আমির এক প্রতিবিম্ব দেখে ফেলি মানস আয়নায়। জেট গতিতে নিষ্পন্ন হয় মধ্য চল্লিশের এক জীবন পরিক্রমা। একেক-সময় একেক আদর্শ ও তদনুযায়ী মূর্তি ছিল অনুসরণযোগ্য : চে-কাকা-মাণিক-ঋত্বিক-শেফালি-মহুয়া··· । আদর্শ ও প্রেম সেইরকম রূপকথা যা আমার শৈশবই প্রলম্বিত করেছিল শুধু। বীর নই, প্রেমিক নই, অতিভীতু, মৃত্যুডরানো এক গর্তের জীব, যার ভবিতব্য মৃত্যু, শুধু মৃত্যু— বোধে এ-জিনিস সঞ্চারিত হতে এতদিন লেগে গেল !

৪.১.৯৫। সময় সন্ধ্যা। স্থান ঐ। সবকটি টেবিল উপছে পড়ছে, সমস্ত মুখ কথার জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। এই কথা স্রোতে স্বপ্ন, বিষণ্ণতা, দুঃখ, নৈর্ব্যক্তিক সংবাদ, আশানিরাশা, প্রকল্প, ইতিহাস, ব্যক্তিগত অনুভব কী নেই। বহুর এই কণ্ঠস্বরকে মোটেই কোলাহল মনে হচ্ছিল না। দু জন কৃষ্ণাঙ্গ ও একজন শ্বেতাঙ্গিনীও সমাবেশে থাকায় মনে হচ্ছিল বিশ্ব কথা বলছে। বহুর কণ্ঠস্বরকে কিছুক্ষণ পরেই একটি গীতের সহায়ক বাদ্য মনে হল আর গীতের কলিটি উঠে আসছিল আমার পাশের এক প্রেমিকযুগলের কণ্ঠ থেকে।

মেয়েটি : আতুতুতু করার কিছু নেই।

ছেলেটি : কতদিন অপেক্ষা করব বলো ? এবারও ফার্স্ট লিস্টে আমার নাম নেই।

মেয়েটি : ভাল করে পড়োনি, পরীক্ষা দাওনি কী করে হবে।

ছেলেটি : তাহলে সব ভুলে এই করে যাই।

মেয়েটি : হ্যাঁ দয়া করে তাই করো। এইসব প্রেমট্রেম ফিলিং টিলিং বাদ দাও এখন, এড়িয়ে চল।

ছেলেটি : কী বলছ !

মেয়েটি : ঠিকই বলছি, অনুভূতি এখন আমাদের কাছে বিলাসিতা, এই জিনিসটি কেনার মতো যথেষ্ট টাকা পকেটে নেই।

অনুভূতি পণ্য। পণ্যটির ক্রয়ক্ষমতা প্রেমিকপ্রেমিকার নেই, অন্তত এখন। তাই এড়ানোর প্রশ্ন, অর্থাৎ নিজেদের তারা বিচ্ছিন্ন করে নেবে অনুভূতি থেকে। মস্তিষ্ক-প্রসূত এক বাস্তবানুগ ব্যবস্থা— এই সিদ্ধান্ত। এবং এমনটা করতে পারা আদৌ অসম্ভব কিছু নয়।

প্রেম নয়, অনুভূতি নয়, এই তরুণতরুণী মৃত্যু নির্মাণে মগ্ন ; একথা কেউ ভাবতেই পারেন। আবার এঁদের ব্যক্তিজীবনের উপর বাধ্যতামূলক সমাজ প্রভুত্বকে নতুন প্রজন্ম নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী মোকাবিলা করছেন এমনও হতে পারে। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনে কিছুটা পরিমাণে স্বাধীনতা পেতে হলে এই ছাড়পত্রটি ছিনিয়ে আনা ছাড়া হয়তো তাঁদের কোনও উপায় নেই।

কোনো এক গ্রিক নাট্যকারের উক্তি এইরকম দৃশ্য ও সংলাপের পাশে মন্তব্যের আকারে লিখে রাখা যেতে পারে : কে জানে হয়তো জীবন মৃত্যু আর মৃত্যুই জীবন।

কফি হাউসে দেখা শোনা প্রেমিকপ্রেমিকারা স্বল্পকালে বা সেই মুহূর্তে ভাষায় নিজেদের প্রেম / আশ্লেষ / সংশ্লেষ যেভাবে প্রকাশ করেছিল তাতে আপাতভাবে মনে হবে : পরস্পরের প্রতি অনুরাগ / অনুভব তাদের কাছে প্রধান নয়।

বরং সেই অনুভূতি যেন পুরাণের আপেল। যা রয়েছে কিছু দূরে, অন্য কোথাও। সেই প্রেমফল বা ফুলটি দেখে তারা যা অনুভব করছে সেইটি প্রকাশ করল শুধু। এ যেন অনুভবের অনুভব এবং চিন্তা। কিছু যুক্তি, নিরাপত্তাবোধ ও সতর্কতা মিশে আছে এতে। জীবন প্রলম্বিত। ভবিষ্যত জীবন বর্তমানের খোপের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। অন্ধ নয় তারা, মোহান্ধ তো নয়ই। ফলে জিনিসটা জটিল, সূক্ষ্ম এবং বেদনার হল। শ্যাম বাঁশি নয় আর। কেউ ভাবতেই পারেন এতে প্রেমজীবনের মৃত্যু হল। আবার কেউ এই দৃশ্য ও সংলাপে আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন ভিন্ন এবং সম্ভাবনা : যখন অন্য কোনও প্রেমিকপ্রেমিকা দায়মুক্ত হওয়ার কথা ভাববে। সম্পর্কের সৌধ নির্মাণ তথা তাকে জীবনের সমান সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় করার কথা কল্পনাতেও স্থান দেবে না। এবং সেইদিন ব্যক্তির অমর প্রেমকাহিনীর লৌহবাসর ভেঙে তারা নির্ভার, মুক্ত ও প্রেমের যোগ্য হয়ে উঠবে।

[ বাংলা ভাষার রচিত বহু গল্প ও উপন্যাসে প্রেম বীজ বস্তু। রাধাকৃষ্ণের গল্প তো জানেন সর্বজন। লেখাটির এইখানে পৌঁছে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেইসব লেখকের কথা এবং একটি ক্যাপশন : ]

**অনুভূতির ফেরিওয়ালা**

যে কোনও লেখার খসড়া আর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটা তফাত থাকবেই আর তা হল কন্টিনিউইটি সংক্রান্ত। সময়, চিন্তা এসব সগোত্রধর্মা, ছেদ, খাত বদল থাকবেই। প্রেমকে ঘিরে প্রতিদ্বন্দ্বী জগৎচিত্রের ইশারায় রাস্তা হারালাম, সংশয় তথা অসম্পূর্ণ জ্ঞান হল। আবার জানা একটি ক্রিয়াপদ বলে সে পুনরাবৃত্তিমূলক এবং অসম্পূর্ণই… আমরা বরং ফেরিওয়ালাটিকে লক্ষ করি, কারণ জগৎ বদলে এখন দোকানদার ও ফেরিওয়ালাই সাধক। শিল্পায়ন, উদারনীতির দৌলতে বিশ্ব আজ আর রঙ্গমঞ্চ নয়, এক বৃহৎ বাজার বিশেষ।

ফেরিওয়ালাটির পরিচয় জানা বেশ জরুরি, রক্তমাংসের মানুষ ও তার পার্থিব প্রেমকে ইনি বিমূর্ত করেছেন, গল্প করে তুলেছেন। সুতরাং দেহিপদপল্লব…

প্রেমের গল্প, প্রেমের অনুভূতি ( তার বর্ণনা ) সাহিত্যিক বিক্রির জন্য বাজারে ছেড়েছেন অনেক আগে— সাহিত্যে এ জিনিসটা পণ্য হওয়ার এতদিন পরে বাঙালি প্রেমিকযুগল অনুভূতির ক্রেতা হল। পণ্য খদ্দের খুঁজে পেল। খদ্দেরের জন্ম দিল। মৌখিক সাহিত্যে / কীর্তনে / বাউল গানে / কথকতায়ও প্রেম ছিল কিন্তু তখনও পণ্যচরিত্র অর্জন করেনি।

SUNEEL '94

SUMEEL '94

আমাদের শৈশবে / কৈশোরে সাহিত্য অনুযায়ী জীবনের এক নামগান চালু ছিল। সেইটি শুনতে-শুনতে আমরা স্কুল পালিয়ে হান্টারবালি ছবির নায়িকার বিপুল বিশাল বুকের ঢেউ, কুয়োর মতো নাভি দেখেছি, সিগারেট ফুঁকেছি, এস এফ আইয়ে নাম লিখিয়েছি, ভূতপ্রেতভগবানকে অমান্য করেছি কিন্তু অমর প্রেমকথা চোরা স্রোতের মতো বয়ে বেড়াতাম। বালবাচ্চা-বৌ নিয়ে নাটাঝামটা খাওয়া মানুষকেও দেখেছি নর-নারীর এক পতি-পত্নী সম্বন্ধীয় প্রেমের নামে মূর্ছা যেতে।...

ছেদ।

এক সপ্তাহ এক লাইনও লেখা হয়নি। ভাল লাগেনি লিখতে, জরুরি বলেও মনে হয়নি। কিছুটা বিরক্তও লাগছিল। উৎপল-মিহিরের নির্দেশ পালন করতে হবে কিন্তু নির্দেশটি ছিল এইরকম : সাহিত্যে বিমূর্তায়ন কী ভাবে ঘটে— লিখতে হবে। এর জবাবী আদর্শ লেখা এরকম হতে পারত বলে মনে হচ্ছে :

(এক) ভাষা চিহ্ন ঠিকই কিন্তু সাইন সিম্বল হয়ে ওঠে— রুমাল লিখলাম— কিন্তু সেইটি তাতে নরম একটুকরো কাপড় হয়ে গেল এমন নয়, আগুনের রুমাল নেড়েও তো কতজন চলে যায় কিংবা সেই বিড়ালের কথা ভাবুন যে ছিল আসলে একটি রুমাল। শব্দ যখন যেমন সঙ্গী পাচ্ছে তখন সেই রূপ নিচ্ছে, শব্দ বা স্থান বদলালে সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাবে তাৎপর্য।

(দুই) বাস্তববাদী বা পরাবাস্তববাদী সমস্ত লেখাতেই এই বিমূর্তায়ন ঘটে থাকে। বিমূর্ত শিল্পসাহিত্যের একচেটে নয় এ জিনিস।

(তিন) এর বাইরে কিস্‌সু বলার-লেখার নেই— মানস আয়নার খেলা এটা। ম্যাজিক।

(চার) ফর্ম-কনটেন্ট / সমাজ বাস্তবতা এসব নিয়ে বরং পাতার পর পাতা লেখা যায়। শিক্ষিত পাঠকরা এরকম বহু লেখা পড়েছেনও দেশি বিদেশি ভাষায়।

(পাঁচ) ঐসব লেখকরা যথেষ্ট পণ্ডিত। বিমূর্তায়নের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে লেখা সম্ভব হলে তাঁরা নিশ্চয়ই লেখা উৎপাদনের এই ভয়ঙ্কর চাপের দিনে অমন একটা জমি ফাঁকা ফেলে রাখতেন না।

(ছয়) আমি সেই মশা এবং বলছি : কত জল ?

১৩.১.৯৫

গতরাত্রে পার্ক স্ট্রিটের অলিম্পিয়া বারে সাহিত্যরসিক বন্ধু মল্লিনাথের সঙ্গে উপন্যাস সম্পর্কে ( আমরা অবশ্য বরাবর 'নভেল' শব্দটিই উচ্চারণ করেছি ) বিস্তর কথা, তর্ক, আলোচনা হল। আমরা একটা কোণ বেছে নিয়েছিলাম, পান করছিলাম খুব ধীরে ; আলোচনা-তর্কের স্বার্থে। অলিম্পিয়া দরে-দস্তুরে এখনো মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে। যদিও পাশের টেবিল থেকে কেবলই শেয়ার-ইউ টি আই ইনভেস্টমেন্ট প্রভৃতি শব্দ ভেসে আসছিল।

গতকালের কথাবার্তা যতটা মনে আছে লিখে ফেলা যাক :

[ ঠিক যে ভাষায়, যেভাবে কথা হয়েছিল হুবহু তা মনে করতে পারব না। পাঠক এর সঙ্গে পরিবেশ মিশিয়ে নেবেন। মাঝেমধ্যেই আমরা নভেল আলোচনা থেকে সরে গিয়ে অন্যান্য বিষয়েও কথা বলেছি, যথা খাদ্য, পানীয়, পোশাক, পেশা, রাজনীতি, এমনকি মৃত্যু। কিন্তু এখানে আমি সেসব বাদ দিয়ে যাব। যেমন ছিপছিপে শরীর, ডিম মুখের লম্বাটে একটি মেয়েকে নিয়েও আমরা কথা বলেছি, এই প্রসঙ্গে খুব খুশি হয়ে, শিশুর মতো হাততালি দিয়ে উঠেছিলাম প্রায়, দুজনে একসঙ্গে প্রশস্তি করেছি তার 'কী নির্মেদ শরীর— হাল্কা ঢেউ তাই না'… ]

ম ॥ বাংলা ভাষায় দেখেছি নভেল বলতে বেশ মোটাসোটা বইকেই বোঝায় এই মেয়েটির মতো নয়

রা ॥ কবিতা ছিপছিপে— দিবারাত্রির কাব্য

ম ॥ ব্যতিক্রম। এক অন্য ধরনের নির্মাণ

রা ॥ নির্মাণ মানে কী রে, নভেল নিয়ে কথা উঠলেই দেখেছি স্থাপত্য-নির্মাণ এইসব কথা বলা হয়।

ম ॥ নির্মাণ আর সৃষ্টি এতে গুলিয়ে যাচ্ছে, সমার্থক হয়ে যাচ্ছে— বাড়ি বানানো, ব্রিজ বানানোও তো নির্মাণ। আসলে সৃষ্টি জিনিসটার মধ্যে একটা গঠনশৈলী, কাঠামো হয়তো থাকে, সন্তুর বাদক শিবকুমার বা অন্য যে কেউ একটি রাগকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন যে ভাবে— মজা হল সৃষ্টির মধ্যে এই গঠন নির্মাণ থাকে কিন্তু সেটাই সৃষ্টি নয়— তার অতিরিক্ত কিছু, একটা উদ্বৃত্ত থাকে। তুই দিবারাত্রির কাব্যের কথা বলছিলি, ধ্যাত, কারুবাসনা পড়, আরুপরতন আমাকে বলেছিলেন 'দেখুন ওই নামটাই বইটির ফার্স্ট সেন্টেন্স— কারুকামনা নয়, কামনা ভোগে শেষ আবার তার জন্ম হতে পারে কিন্তু বাসনা এক অনন্ত তৃষ্ণা'। দস্তয়েভস্কি থেকে বর্হেজ…একটা কন্টিনিউইটি। কারুবাসনা হে

রা ॥ অ্যাতো নেম ড্রপ করিস…

ম ॥ বেশ জীবনানন্দেই থাকি, দেশজ হবে, নেমড্রপের প্রশ্নও উঠবে না।

রা ॥ না, মানে আমি তোর যুক্তিটা বুঝতে চাইছি। আসলে অনেক বই পড়ে ফেলা আর চেতনার সমৃদ্ধি এক কথা নয়। বই পড়ার অসভ্যতাও কম দেখিনি। মুগুর ভাঁজা পেশী দেখানোর পর্যায়েও তো নিয়ে যায় অনেকে। প্রতিপক্ষকে চুপ করাতে, ভয় দেখাতে বিশ-পঁচিশটা বইয়ের নাম করল ধর— এরকম তো করে লোকে ; না কি ?

ম ॥ হ্যাঁ, তা করে। আমরা বই-বই কথাও বলে ফেলি, আবার সেটা পাত পেয়ে যায় বলে সাফল্যের যে সর্বনাশ তাতে মেতে আরো বেশি করে বই হয়ে উঠি দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন সমেত।

রা ॥ আবার উল্টোটাও আছে। জীবনপাত করে লেখা কেতাবটি কী বলতে চায় ধৈর্যের সঙ্গে মাথার পরিশ্রম করে সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম না ভাল করে—

আইটালিক্সের আই-এর তাড়নায়— প্রায় রিপন তাড়নার মতো নিজের মনগড়া একখানা জম্পেশ ব্যাখ্যা-মন্তব্য হাজির করতে অতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

ম ॥ বড্ড ডাইগ্রেশন হচ্ছে।

রা ॥ নভেলে সেটা শুধু পারমিটেড নয়, এ একটা শৈলী— যা উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টির সহায়ক।

ম ॥ তুই যাকে উদ্‌বৃত্ত বলছিস সেটা আসলে কী

রা ॥ সাহিত্যে, গদ্যে পদ্যে অক্ষরমালায় রচিত বাক্য, পংক্তি, অনুচ্ছেদে যা আমরা বাহ্যত পাই সেটা জগৎচিত্র। জানার পাল্লা যে এতে ভারী হচ্ছে তা কিন্তু নয়। যদিও সাহিত্যে এই জগৎচিত্র বহুস্তরের— পাঠকের যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে এসবের ভাগ পায়। কেউ কেউ সব ক'টা পর্দা ছুঁতে পারে না। কেউ-বা অনেকটাই পারে।

ম ॥ পুরনো কথা। এটুকু সবাই জানে। এক স্প্যানিশ লেখকের কথা মনে পড়ছে, তাঁর কথাটা ছিল প্রায় এরকম: সাহিত্যের অভ্যাস হল পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা, তার বিশদ বিবরণ পেশ, লেখায় কিছু শীর্ষবিন্দু সৃষ্টি করা এবং সেগুলো ভাল করে দেগে দেওয়া

রা ॥ কার কথা বলছিস জানি না তবে ঐ লেখকটি যদি সাহিত্যের অভ্যাসের বাইরে যেতে চান

ম ॥ হ্যাঁ আর বাইরে মানে এমনকি দেশকালেরও বাইরে, কাল্পনিক জগৎ সেটা, ইউটোপিয়া মানে নেইদেশ কিন্তু মিথ্যে নয়, একে বলা যেতে পারে প্রতীকী বিশ্ব।

রা ॥ একটা স্ট্রেঞ্জনেস দেখতে পাচ্ছি

ম ॥ হ্যাঁ, আর উদ্‌বৃত্তের, সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের অনন্ত উৎস সেটাই।

রা ॥ একে কী করে ব্যাখ্যা করা যায়

ম ॥ টেক্সটে এ জিনিসটা মায়ার মতো, ধর, সে নিজে সশরীরে হাজির নয় কিন্তু তার অস্পষ্ট ছায়া আছে। যেমন সিম্ফনির একটা জাঁকজমকের অংশ শুনতে শুনতে ঝুপ করে স্তব্ধতা নেমে এল কিন্তু তখনো চূড়ান্ত ক্ষীণ শব্দে ফ্লুট বাজছে হয়তো, আবার বাজছেও না, তবু এমন একটা রেশ সৃষ্টি হচ্ছে যে মনে হচ্ছে আছে তো। অন্যরকম ভাবে বললে আমরা যখন সাহিত্য পড়ি তখন কোনও বিশেষ একটা জায়গায় এসে বই থেকে চোখ তুলে নিই অর্থাৎ অক্ষর তখন মুছে যায়। কামুবাসনার একটি লাইন এরকম: 'চিঠিগুলো উইয়ের পেটের ভিতর গিয়ে তাদের শরীরের মাংস ও রস জোগাচ্ছে, নীড় বাঁধতে সহায়তা করছে তাদের, তাদের ডিম ও সন্তানসন্ততির কাজে লাগছে' —এই বাক্যটিতে জীবনানন্দ সেই মুছে ফেলার কাজটা সারলেন যত্নে, নৈপুণ্যে। এটি কালান্তক, যম। বিনাশ সৌন্দর্য। এর আগে সাদা পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সমস্ত অক্ষর উইয়ের পেটে গেল, তারা নিশ্চিহ্ন হল।

ধ্বংস কিন্তু সৃষ্টি··· আগুন···

রা ॥ বলছি, কারুবাসনায় এরকম বাক্যও আছে, দাঁড়া মনে করি··· হ্যাঁ—
'নানারকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের ছিবড়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে, তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি'—
হাজার মানুষের পড়া, ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন প্রকার মতের সিলমোহরে আমাদের প্রিয় বইগুলি হারিয়ে গিয়েছে। পড়তে গেলেই সেইসব এঁটো চিন্তা মাথায় ভর করে, কিছুতেই ঠেলে সরানো যায় না। রবিঠাকুরের আঁকা ছবি দেখতে, বা করিম খাঁর গান শুনতে গেলেও এই হাল হচ্ছে।

ম ॥ তোদের মুশকিল কী জানিস বাজার চলতি যা পেলি গোগ্রাসে গিলে ফেলিস। মেজাজটা খিঁচড়ে দিলি। নামধাম না করে দেরিদা টেনে আনছিস। আমি অন্য কথা বলছিলাম— সাহিত্যের অন্তর্জগৎ নিয়ে কথা হচ্ছে। এ দিকটায় কখনোই তেমন আলো ফেলা হয়নি। এই যে আগুন প্রসঙ্গ তা আসলে আলোকিত করছে অন্যকিছু। মনন মন্থনের ব্যাপার এটা— তার প্রসার ও গভীরতা সাহিত্যে রূপায়িত— চিন্তা এখানে অনুভবও— এইরকম সাহিত্য ও তার সোর্সের একটা আভাস পাচ্ছি আমরা।

রা ॥ দাঁড়া আমার ঝোলায় কারুবাসনা আছে, একটা অনুচ্ছেদ শোন, তারপর গাল দিস—

'.....কয়েকটা কাজ করতে তোমাকে নিষেধ করছি আমি, তুমি করতে যেও না। চাকরি-বাকরি না পেয়ে অলস হয়ে থাকতে হচ্ছে বলে মিছিমিছি নিজেকে নির্যাতিত করতে যেও না, তোমার চেয়ে কম শক্তি নিয়ে অজস্র লোক সংসারের কাছ থেকে ঢের বেশি পুরস্কার পাচ্ছে বলে। কলকাতায় অহরহই এই জিনিশ দেখবে তুমি, দুঃখ পেতে যেও না, কারু প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, ট্রাম-বাস-লরি-মোটর ব্যস্ত-সমস্ত নিরবচ্ছিন্ন ভিড়ের সমাবেশ নিয়ে কলকাতা শহরের কাজের চাকা দিনরাত ঘুরে চলেছে বলে নিজের মনের স্থৈর্য নষ্ট করে বসো না···ফ্যাকরা হচ্ছে এই যে চারদিকের ঘাতপ্রতিঘাতের সম্পর্কে তারা মুহূর্তে-মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে ঠিকরে বেরোয়; নিজের প্রকৃত পথ ভুলে যায়, আগুনের মুখে দেওয়ালি পোকার মত জীবনের যথার্থ সম্ভাবনাগুলোকে বারংবার অন্ধভাবে নষ্ট করে ফেলে'—
হেমের বাবা বলছেন।

ম ॥ মজার ব্যাপার আগুন কিন্তু এখানেও আছে। আছে পোকাও। আর সম্ভাবনা। বাংলা থেকে বহুদূরের প্রাগে বসে একজন কাফকা যা মন্ত্র জপেছেন— শিল্প

এই সম্ভাবনা, তার জন্ম…

রা ॥ বেশি কাব্যি হয়ে যাচ্ছে বস্…

ম ॥ হ্যাঁ থামতে জানা চাই, ভাষায় এই দাঁড়ি চিহ্নটির, ফুলস্টপের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খুব কম আছে…

[ অলিম্পিয়ায় এরপরও আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম— তবে পরের কথা হয় খুব এলোমেলো, আমাদের মনঃসংযোগের ক্ষমতাও দ্রুত কমে আসছিল, আর সেসব ভাল মনেও নেই। ]

**লেখাই জন্ম**

মল্লিনাথের সঙ্গে তক্কে জীবনে কখনো জিতিনি। অবশ্য হারজিৎ গৌণ, ওকে শুধু উস্কে দিতে হয়, জ্বলে তেল, কিন্তু সলতেও চাই। অফিসকরা হাবিজাবি কাজে চাপা পড়া অবস্থায়ও সেদিনের আলোচনা মাথার মধ্যে ভুরভুর কাটছিল আর ঘুরে-ফিরেই মনে হচ্ছিল : লেখার গোটা প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়েই আমরা জন্মাই— আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করি।

তীক্ষ্ণ এক উদ্বেগ ভাষা অধিকারীর— এই উদ্বেগের করুণা গভীর, বিশদ ও ব্যাপক-ভাবে বর্ষিত হলে না লিখে উপায় থাকে না— লেখা এক সন্ধান তখন, মুক্তিসন্ধানও বলতে পারি একে, সেই অসম্ভবের রূপ নির্মাণ, মানে ভাল ভাল কথা ও অনুভূতিমালা নয়— জাঁ জেনের নরকও তাতে উদ্ভাসিত হতে পারে— আর তাতেই সংঘটিত হয়, রূপ পরিগ্রহ করে স্ট্রেঞ্জনেস—যার বাংলা উদ্ভটত্ব নয় আবার অলৌকিক বললেও গোলমালের আশঙ্কা থাকে— বরং এ-দুয়ের অন্তর্বর্তী কিছু।

আদি সাহিত্য কাব্য / স্তোত্র। সত্যকথনের সম্ভাবনা, বা ঐসব শ্লোককে সত্যের লিপিরূপে ভাবতেই অভ্যস্ত আমরা— এর মূলে আছে সম্ভবত সেসবের অতর্কিত, সহসা আবির্ভূত হওয়ার ক্ষমতা, তার বিদ্যুৎ ঝলক। গল্প আছে :

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ পেরোনোর সময় নিতান্ত বালক বয়সে আকাশ চেরা বিদ্যুৎ ঝলক দেখেই রামকৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বর চেতনার জন্ম হয়। এখানে ঈশ্বরকে 'সত্য' ধরতে হবে—

গল্প আরো আছে : মিউজ/সরস্বতীর ; সাহিত্যের জননী নাকি এরা। প্রেরণাও ভাবা হয়েছে একে। আর এখন আমরা ভাবি নিশ্চেতনার কথা। নিশ্চেতনার হাত ধরে ভাষার প্রতিটি দানাকে লক্ষ করলে দেখব শব্দ মন্ত্রে ছিল, তারও আগে শব্দমন্ত্র, জাদু শব্দ তখন। সেই জাদুশক্তির পুনরুদ্ধারে মেতে আছি একদল পাগল। জাদুপ্রতীক শব্দ একটি মুহূর্ত, ঘটনা, পরিস্থিতির চিত্রাঙ্কনেই নিঃশেষ হয়ে যায় না, সে বস্তু, প্রকৃতি অনুভব ও চিন্তাকে জীবনদান করে— আলো আসুক বলা মাত্র চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, প্রতিটি রোমকূপ ধন্য হবে ওই স্পর্শে।

**রেখা সান্যাল কাঁদছেন**

এখন সমাজ দূরে, বিভিন্ন কর্মব্যস্ততা যানগতি মাত্র, যা কখনো যানজটও বটে। সফল-অসফল কলকাতার মানব-মানবীরা নিজেদের নয়, অন্য কারো, অন্য কিছুর মস্তিষ্ক-নির্দেশে আত্মপ্রচার, আত্মশ্লাঘা বা নিদারুণ অপমানে বিকৃত, কুঁকড়ে যাচ্ছে দেখি, তাদের দেহ-মন-মনন তালগোল। তবু ভাষা আছে, শেষ হয়নি সে, মরে যায়নি, বারবার বেঁচে ওঠার, নবযৌবনের প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তার কম্পন সেই জরুরি বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে শ্বাসাঘাতে। ঐ তালগোল থেকে উঠে আসছে গোঙানি ও আর্তস্বর, শোনা যাচ্ছে চিৎকারও। শব্দরা পরস্পরের উপর হুমড়ি খেয়ে, এ ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, একে অপরকে লোপাট করে কুরুক্ষেত্র করছে, সিম্ফনির ঝঙ্কার তা, ক্ল্যাইম্যাক্স, এক মুহূর্ত পরে ফ্লুট বেজে উঠবে। কিন্তু কোথায় সেই বাঁশি শব্দ, কোথায়ই-বা ক্ল্যাইম্যাক্স। এ তো শুধুই কোলাহল। তারা এর নাম দিয়েছে জীবনমুখী গান/জীবনমুখী সাহিত্য।

রচনাকর্তা, পদকর্তা হওয়ার যে মহাজনী স্বপ্ন, উচ্চাশা বাংলার জলের দেশে, সবুজের দেশে শ্লোমুভিচিত্রে, কীর্তনসুরে ভক্তি গদগদ ছিল, সেই দেশ ভাঙনে শেষ। তা সুন্দরবনের ঘোড়ামারা দ্বীপ, জল সহস্র ফণা, তাড়া করছে আর গ্রাম ভেঙে পড়ছে। জলেরও যে দুপাটি দাঁত আছে, সবুজস্নিগ্ধতায় আছে পচন— ইত্যাকার জ্ঞান কে চায়! স্নিগ্ধ সাহিত্য, যা পড়লে মন ভাল হয়ে যায়, যা প্রতিদিনের ক্লেদ, পচা রক্ত, বসা মাছি থেকে দূরে, হিংসা আর লোভ আর মরুর আগুন বালির শুষ্কতা ভোজবাজির মতো উড়িয়ে নিয়ে যায় কোথায় সেই ঘুমের বড়ি, স্নিগ্ধ সাহিত্য! এই কথা বলে ফার্স্ট জেনারেশন মহিলা এক্‌জিকিউটিভ মোটা ঠোঁটের রেখা সান্যাল কেঁদে ফেলে-ছিলেন (ভাবা যায়!) মিস রেখা সান্যালের দেহ কলাগাছবৎ আমার বুকে, তাঁর মাথা আমার কাঁধে ঝুলে পড়েছিল, আমার চিবুক ও কণ্ঠার মাঝখানটায় আটকে যায় রেখা সান্যালের মাথা, কার্নিশে চাঁদিয়াল ঘুড়ির বাতাসতাড়িত ঘসটানি মনে পড়ে, রেখা কাঁদছেন, ফোঁপাচ্ছেন, সর্দি আর লালায় আর চোখের ঘন আঠালো জলে আমার সার্টটির বারো বেজে গেল।

[ বিশ্বাস করুন, একশোভাগ সত্যি, সত্যি এরকম ঘটেছিল। আমি এ ঘটনা টুকে দিলাম রেখা সান্যালের কান্না সাহিত্য সম্বন্ধীয় বলে নয়— শুধু বৈচিত্র্যের লোভেও নয়— লেখাটিকে প্রবন্ধের হাত থেকে বাঁচাতেই এই প্রক্ষেপণ। ]

রেখা সান্যাল নিঃসঙ্গ নন; সাহিত্যে দর্শন, সত্য, সমাজ খুঁজে হয়রান বহু লেখক পাঠককেও প্রায়ই আক্ষেপ করতে দেখি, এসব যথেষ্ট মাত্রায় না-পাওয়ায় তাঁরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ হন। তাক থেকে বই পেড়ে ধুলো ঝেড়ে সাহিত্যের সংজ্ঞা দেখান এবং বিড়বিড় করেন: এসব কোথায়? যশের জন্য নয়, ক্ষমতার জন্য নয়, লিখে দেশের মানুষের উপকার করতে হবে। নীতিকথামালা চাই। সাহিত্যে যে এরকম

কোনও উপযোগিতা পূরণের ব্যাপার নেই, এ যে কোনও পরিষেবা নয়, রেখা সান্যাল তা শুনতে নারাজ। আবার উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে যেমন শাস্ত্রজ্ঞান ভাল না থাকলে প্রশ্ন করার অধিকার জন্মায় না সেভাবে, সাহিত্য তো তা নয়। আমি পড়তে পারি, সমস্ত শব্দের অর্থ জানি— এটাই যথেষ্ট। যদি তুমি তা মেনে না নাও তাহলে এলিটিজম করছ।

এত সব প্রশ্ন, দ্বিধা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কেউ লিখতেই পারেন, লেখেনও বটে। কার জন্য লিখি, কেন লিখির জবাব হরলিক্সের বিজ্ঞাপনের শিশুটিই দিতে সক্ষম : আমি তো এমনি-এমনি লিখি।

লেখার টেবিলের উল্টো দিকে কেউ শ্যেনদৃষ্টির পাঠক বসিয়ে রাখেন না এ যেমন সত্য তেমনি খাতার উপর ঝুঁকে পড়া হাত, কফির ধোঁয়া, ভুতে পাওয়া এক মুখমণ্ডলও কোনও ব্যক্তি লেখকের নয়, ঐ হাত নগ্ন, নির্জন :

'কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।'

পাটিগণিতের সাধ্য নয় বোধ-বুদ্ধির এই স্তর স্পর্শ করে। অতএব, দুর্বোধ্য। কেননা সহজ বুদ্ধিতে এই তিনটি লাইন তিনটি অক্ষর মাত্র : অ তী ত। কিন্তু তা মূর্ত নয়, স্পষ্ট নয়, অস্পষ্টের অস্পষ্ট, এমনকি সেই ক্ষীণেরও আভাস মাত্র। বোঝার জন্য, ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি পরম্পরায় বোঝার মতো কিছুই নেই এখানে, শব্দের এই মূর্ছনা তার প্রায় সংগীত হয়ে ওঠা আমাদের সজাগসচল সাংসারিক বুদ্ধির সঙ্গে কোনও সংলাপের অবতারণা করতে পারে না— তাই এ ব্যর্থ।

এই ব্যর্থতা, এভাবে গভীর বেদনার্ত অথচ একান্ত সংগোপনে ব্যর্থ হওয়া এক প্রেম-সম্ভাষণ— একার শিল্প। পাঠক সমাজ, লেখক সমাজে এর স্থান নেই এবং এর অস্তিত্বই নেই— এর অস্তিত্ব
ঘোষণা নেই বক্তব্য নেই যেন শরীরও নেই ক্ষয়ের বলয়…

**মুখমুখোশ**

জোজো দু বছরের এক দামাল শিশু, আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়ল।

ঘটনাটি এরকম :

বাঘ সিংহ বাঁদরের মুখোশ এঁটে জোজোকে ভয় দেখাচ্ছিলাম আর ও বারবার ছুটে এসে টান মেরে খুলে দিচ্ছিল সেসব। এই খেলায় ছুটোছুটিতে শেষতক ক্লান্ত আমি, হাঁফাচ্ছিলাম। মুখোশহীন আমাকে কিছুক্ষণ নজর করে হঠাৎ-ই ও ছুটে এসে আমার দাড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। যত বলি ওটা আমার দাড়ি, মুখোশ নয়, ছাড় জোজো, ও ততই জোরে টানতে থাকে।

অভ্যাস, রেওয়াজ, প্রথা সাহিত্যের উপর এরকমই একের পর এক মুখোশ চাপিয়েছে।

পরিস্থিতি এমনই এখন সেসব ছাড়াতে গেলে ছালচামড়া অবধি উঠে যাবে। সামাজিক মানুষ, সভ্য মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, দলের মানুষ, পারিবারিক মানুষের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মানুষকে খুঁড়ে আনা যেমন আজ প্রায় অসম্ভব।

মূর্তি ভাঙার রাজনীতি ধোপে টেঁকেনি কিন্তু সে গোপন ও সাঙ্কেতিক রাণীর মতো হাতে গুঁজে দিয়েছিল মূর্তিভাঙার সংস্কৃতির একটি চিরকুট। সেটি আজও অম্লান। সাহিত্য বনাম সাহিত্য— এই লড়াই বহুদিনের, একেক প্রকার সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে সাহিত্যের এই কুণ্ঠার যে বারবার ঝলসে উঠেছে তার মূলে রয়েছে বিমূর্তের টান। ক্রমাগত আবরণ উন্মোচন। সমাজসেবামূলক সাহিত্য এই গোত্রভুক্ত নয় বলা বাহুল্য। বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে অতীতে একটা কথা চালু ছিল, এখন আর কারো মুখে সেই কথাটি বিশেষ শুনি না। সাহিত্য সেবা, সাহিত্য সাধনা নামে চিহ্নিত করা হত লেখালিখিকে। এতে একটা পুজোপুজো গন্ধ আছে ঠিকই কিন্তু তার বিকল্প লেখালিখি শব্দে খাটাখাটনি ছাড়া যেন আর কিছুই নেই। আর সত্যি মোটা মোটা উপন্যাসের দিকে তাকালে, হাতে নিয়ে তার ওজন পরখ করলে খাটনির গতিক দেখে রীতিমতো ভয় লাগে। আবার শ্রদ্ধাও জাগে— লেখক ভদ্রলোক না জানি কত দিন কত রাত টানা লিখে গিয়েছেন, বিরক্তি ক্লান্তিতে নিঃশোষিত না হওয়া পর্যন্ত। এই কেজো স্বভাব, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে উপন্যাসের শৈশবযুগের সেই একটি গল্পকে পরম্পরায় সাজানোর রীতির প্রতি সশ্রদ্ধ থেকে খেটে চলার মধ্যে বেচারা লেখক উদ্ভাবনের নেশা এবং সুখ থেকেও বঞ্চিত করেছেন নিজেকে শুধু পাঠকের চাঁদপানা মুখের কথা ভেবে। এই পাঠক পরিষেবা গুণমানের দিক থেকে সমাজে প্রচলিত সমস্ত পরিষেবার মধ্যে যে সেরা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুঃখ হয় এঁরা কিন্তু সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক পান না। দু-একটি পুরস্কার জোটাতে পর্যন্ত কত না খিদমত করতে হয়, কত লোকের মন জোগাতে হয়। পাঠক পরিষেবা কেড়ে নিয়েছে সাহিত্য সেবা, সাধনা— কেড়ে নিয়েছে আনন্দ— এ আনন্দের ফল নয়, প্রেমিকপ্রেমিকার আনন্দমথিত সন্তান নয়, হৃদয়হীন নিরুত্তাপ মিলনের উৎপাদন মাত্র।

শয়তানকেও তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা অনুচিত : পাঠক তথা বাজার-দাস সাহিত্যেও কিন্তু এরকম নজির মিলবে যেখানে বস্তুজগৎ তার বাহির্ভাগ খসিয়ে বিমূর্তায়নের হাত ধরে হাজির হয়েছে কিছুটা নবরূপে। তবে সেখানে এই লক্ষণ সাধারণ, ব্যাপক নয়। এই প্রক্রিয়ার সৃষ্টিধর্মই তার বাধা। ঐ ধর্ম ব্যক্তি পাঠকের জন্য বহু সাঙ্কেতিক চিহ্ন রেখে দেয়— দুটি বাক্য ও পংক্তির মাঝখানেও থেকে যায় কিছু লেখা কিছু পড়া। ঐটি সৃষ্টিশীল পাঠকেরই লেখার ও পড়ার কথা এবং এতে সাহিত্য থেকে যাচ্ছে জায়মান। এই উন্মুক্ত স্বভাব, এই সম্ভাবনা তাকে শেষ হতে দেয় না। আবার এ জন্যই সে কোমল, ভঙ্গুর। কাঠামো-সর্বস্ব লৌহবাসর নয়, চূড়ান্ত নয়, মৃত্যু নয়।

অনন্ত উন্মোচন।

সাহিত্যের জগৎচিত্রে যেজন্য ভবিষ্যৎ, বর্তমান নেই। সময় এখানে একমাত্রিক, শুধুই

অতীত। কখনো সে সুদূর কখনো প্রায় নাগালের মধ্যে, কখনো ঘাড়ে তার তপ্ত শ্বাস টের পাই। অতীত জাদুঘরটির নব্বুই শতাংশ প্রত্নসম্পদই রয়ে গিয়েছে অন্ধকারে। আর যাদের দেখেছি তারাও পূর্ণ আলোকিত নয়। আলো আর ছায়ার সেই অতীতের সঙ্গে ঘর করাকে দ্রুতগতির জীবনের একবিংশের কোনও নাগরিক শবসাধনা বলে চিহ্নিত করলেও কিছু বলার নেই— হ্যাঁ, হয়তো তাই। এবং সর্বজনীনতার গর্ভও বোধহয় এটাই। নতুন তাৎপর্য, ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিকোণের ছোঁয়ায় পুরনোর নতুন হয়ে ওঠা বা এতকাল গোপন ছিল এমন কিছু বাণী ও রূপ প্রকাশ করা— ইত্যাদি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যুগলবন্দিও বলা যেতে পারে। অনাগত সময় এতে স্বীকৃতি পেল, আবার তাকে কোল দেবার জন্যও রইল একজন, সে আদি। আদি আর অন্ত সৃষ্টি করল অন্তহীন। শেষেরও যে শুরু আছে, শুরুরও শুরু আছে, আমরা এক লহমায় চলে গেলাম সেই মৌখিক সাহিত্যের কালে। সংগীতের, স্তবের দিনে, শিল্প যখন প্রার্থনা।

**জীবনকে কোনও আলাদা জগতে নিয়ে নতুন করে তাকে সৃষ্টি করা —সমান্তরাল ভিন্ন এক জীবন…**

এ সৃষ্টি ভাষার। কিন্তু এ কোন্ ভাষা? একালের অনেকেই সাহিত্যের ভাষার বিরুদ্ধে। তাঁদের অভিযোগ এ কৃত্রিম। এখানে সব কিছু বানানো এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের শিকলে আবদ্ধ। দ্বন্দ্বের নিরসনে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিই আমি। এই রচনাটির চিন্তা রবারের বলের মতো হাত থেকে পড়ে যায় সিঁড়ির উপর, ড্রপ খেতে-খেতে, মৃদু শব্দ তুলে দৃষ্টির বাইরে একেবারে। পাঁচ পাবলিকের সঙ্গে অন্য নানা প্রসঙ্গে কেটে গেল একটি সপ্তাহ। রবিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি মল্লিনাথ এল ঝুলিঝাম্পা নিয়ে, একথায়-সেকথায় উঠে পড়ল সাহিত্যের ভাষা প্রসঙ্গ (যদিও এপাশ-ওপাশ দু-চার কথা হয় প্রথমে):

ম ॥ দ্যাখো সমালোচকের সংস্কার ও রুচির কথাটা খেয়াল রাখা দরকার, ঐটি তার সীমা। আমার তো মনে হয় সমালোচনা সাহিত্য খুব কমই লেজুড়ের বেশি কিছু হতে পেরেছে, নিরানব্বুই ভাগ ক্ষেত্রেই সে হাঁটতে চেষ্টা করে সাহিত্যের ফেলে যাওয়া পায়ের ছাপ ও চিহ্ন ধরে এবং নিরানব্বুই দশমিক পাঁচ শতাংশ ক্ষেত্রে চিহ্নগুলি ভুলভাবে পড়ে ও বোঝে— যেজন্য সে সমর্থন কুড়োতে গাদা-গাদা নাম টেনে আনে…

রা ॥ অ্যাতো মারমুখী হবার কোনও মানে হয় না, বিশেষ করে এখন তো মনে হয় দেশেবিদেশে সমালোচনা সাহিত্যে যৌবনের বন্যা বইছে— ভাষার ইস্যুটা তাঁরাই বেশি করে তুলে ধরছেন…

ম ॥ এরকম একেকটা সময় আসে ঠিকই কিন্তু এঁরা আশ্রয় করছেন যা, যা ধরে ধরে এগোচ্ছেন সেটা তো গদ্য বা পদ্য…

রা ॥ ধ্যাত, যা তা বলছিস, এতে কী এসে গেল, এও তো একটা সৃষ্টি, সৃষ্টিরই কাজ— এ তো সমালোচনার নামে তথাকথিত নোটবই নয়, ভাষা ও রূপ সন্ধান, পুনরাবিষ্কার।

ম ॥ কিন্তু যে অন্তর্নিঃসহায়তা সাহিত্যের প্রেরণা···

রা ॥ বিশ্বাস নয় ? বিশ্বাসের নিশ্চয়তা নয় ?

ম ॥ এ তর্কে যাব না, তাতে ভাষা প্রসঙ্গ থেকে সরে যাব আমরা এবং শেষ পর্যন্ত জীবনের জন্য সাহিত্য না সাহিত্যের জন্য জীবন এ জাতীয় বোকাবোকা জায়গায় এসে ঠেকব, বিরক্তিতে গলা তেতো হয়ে যাবে।

রা ॥ রাইট।

ম ॥ ভাষা-ব্যবহার সংক্রান্ত একটা মজার গল্প মনে পড়ছে। ধর তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস, যাকে সংলাপ বলা হয়, সেটাই চলছে। কিন্তু চলছে বেশ অদ্ভুতভাবে। কথা বলছিস তুই একাই, আমি এক নীরব-নিষ্ক্রিয় শ্রোতা— বা তাও নয়, জাস্ট বসে আছি তোর সামনে একটা ফিজিক্যাল এক্‌জিস্টেন্সমাত্র। এবার তুই নিজের কথা বলছিস, আবার আমার হয়েও তুই কথা বলে যাচ্ছিস। ফলে তুই যে শুধু আমারই নকল করছিস তাই নয় তোর নিজের বলাটাও নকল হয়ে যাচ্ছে— এটা দুজনের কথাবার্তা নয় ; দুজনের একজনেরও নয়— এক তৃতীয় এসে যাচ্ছে— ধরা যাক সে ভূত···

র ॥ গল্প-উপন্যাসের সংলাপ অংশে একরকমই ভূতের ভাষা থাকে বলতে চাইছিস ?

ম ॥ বিষণ্ণ রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তোমার উচ্চাশাই কি কারণ নয়, সেজন্যই তো দেশটাকে নরক মনে হচ্ছে। তোমার মনের প্রসার— বিস্তারের কাছে এ নেহাতই সংকীর্ণ। রাজপুত্রের জবাবে— জেলখানার কথা এবং দুঃস্বপ্নের প্রসঙ্গ এলে তাকে ফের জেরা করা হয় : স্বপ্ন তো প্রকৃতপ্রস্তাবে উচ্চাশা। জবাব : স্বপ্ন শুধু ছায়া— কথা আরো এগোলে উচ্চাশা হয়ে ওঠে ছায়ার ছায়া— মহাবীর/সম্রাট/সুলতানরা তাহলে রাস্তার ভিখিরির ছায়া···

রা ॥ এইসব কথা রাজপুত্র বলছেন না, আর এতো জেরাও বাস্তবে কোনও রাজপুত্রকে কখনো করা হয়েছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু এ ধরনের কথাবার্তা-আলোচনা হওয়া সম্ভব ছিল— তার জন্য রাজপুত্রের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই ভিখারিরও, স্বপ্ন, উচ্চাশা, কীর্তি, জয় ইত্যাদি শব্দের থলেয় বন্দি কালচারাল কনটেন্টই যথেষ্ট— তারা হই হই করে বেরিয়ে এসেছে থলের মুখ খোলা পেয়ে— কোথাও এরকম কথা ছিল, এরকম কণ্ঠস্বর নিকট অতীতে, ভবিষ্যত অতীতে আছে—

ম ॥ বালকের সন্তুষ্টির জন্যই শুধু সংলাপের ব্যবস্থা— গপ্‌পো বোনা— গপ্‌পো এখানে কিছু নয়, সংলাপও নেই—ভিন্ন এক জগৎবিবরণ পেশ করা হচ্ছে পটচিত্রে···

রা ॥ হ্যামলেটের ওই বচনের প্রতিমূর্তি আবার রাজা লিয়র— মানে ধর লিয়র,

হ্যামলেট ইত্যাদি কুশীলবদের নিয়ে রয়ে গেছে আমাদের না দেখা একটি নাটক। লিয়র হ্যামলেটের বিস্তার বা দোলাচলের প্রতিমূর্তি। হ্যামলেট লিয়রের বীজ।

**কথার বোঝা**

যেভাবে হোক এই বোঝা ঝেড়ে ফেললেই সাহিত্য হল এমন নয়, প্রিয়জনকে চিঠি লেখার সময় কত সংযতবাক মানুষও বাচাল হয়ে ওঠে এবং তাতে সেইসব চিঠির পত্রসাহিত্য গোত্রভুক্ত হওয়াটা যে আটকে যাচ্ছে এমনও নয়। তাহলে কেন সংযতবাক, মিতকথনের প্রসঙ্গ বারবার ওঠে? বরং লোকসাহিত্যে অতিকথনের, পুনরাবৃত্তির ব্যবহার দারুণ অভিঘাত সৃষ্টি করছে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এমন অনেক উপন্যাস, নাটক আছে যেখানে দীর্ঘ ও অনুপুঙ্খ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে, কথা হচ্ছে বেশ উচ্চগ্রামে, এমনই যে তার বানানো চরিত্রটি মাঝে মধ্যে ঝলসেও উঠছে— তবু সেইসব সাহিত্য আজও আমরা ঘুরে ফিরে পড়ি এবং জায়মান থেকে যাওয়ার যে ধর্মের কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি এইসব সাহিত্যে তা যথেষ্টমাত্রায় আছে। ফলে অতীতের পাঠক সেইসব রচনাকে তাজা বলে অনুভব করেছে, তার পরের পাঠকের কাছেও সেসব এসেছে নবরূপে, আজ আমাদের কাছেও তা নবীন এমনকি ভবিষ্যতের পাঠকের চোখেও তা নবরূপেই আবির্ভূত হবে।

সাহিত্যে সত্য, দর্শন, সমাজচিন্তার জন্য যে এটা ঘটছে না তা আমরা জানি। এসবের গল্পশরীরও গৌণ হয়ে যায় একসময় বা হয়ে যেতে পারত যদি না কথার সঞ্জীবনী শক্তি প্রতি মুহূর্তে তাকে জীবনদান করত।

এই পর্যন্ত এসে আমি ঠেকে গেলাম। মনে হচ্ছে একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছি, তবে কেমন একটা বিশ্বাসও অনুভব করছি, না নিষ্ক্রমণ পথ আছে। প্রক্রিয়া, বা রসায়ন যাই বলা হোক সৃষ্টির ব্যাপারটা আর একটু নিশ্চয়ই বোঝা যাবে, দেওয়াল এখনো বেশ দূরেই আছে…

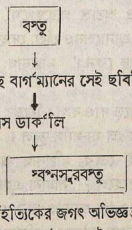


শিল্পীর/সাহিত্যিকের জগৎ অভিজ্ঞতা=শিল্প-সাহিত্য—নিঃসন্দেহে এক ভুল সমীকরণ। তবে একটা সম্পর্ক অবশ্যই আছে। যদিও সেই সম্পর্কের ধরন ও তার জটিলতার খুব সামান্য অংশই প্রকাশিত। সাহিত্যের আলোর সবটাই এসে পড়ল হয়তো অভিজ্ঞতার

কোনও এক বিশেষ অংশের বিশেষ বিন্দুর উপর। বা কল্পনা করুন এই দৃষ্টি-অনুভব হয়ে উঠল আরো প্রান্তিক, এমনকি ফ্রেমের বাইরে চলে গেল—
সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি থেমে গেল, স্পষ্টতাও আর এগোতে পারল না।
হয়-না এমন জিনিস হল।
বাউলরা এটা মর্মে মর্মে বোঝেন, কারণ এঁরা প্রক্রিয়ার সাধক, সিদ্ধ।
দৃষ্টি অর্জনের কথাটাও এসে যায় এই সূত্রে, আমরা শিল্পের-সাহিত্যের সংসারে এর বহু পাগলামি, আতিশয্য দেখেছি। দ্রষ্টার বিশেষ ক্ষমতা পেতে তথা দ্রষ্টা হয়ে ওঠার জন্য র‍্যাঁবো থেকে গিনসবার্গ, মধ্য কলকাতার তুষারকেও দেখেছি মাদকের দ্বারস্থ হতে। বাউলরা বিস্তর গাঁজা খান আজও। কবি জীবনানন্দ নেশাভাঙ করতেন বলে শুনিনি কিন্তু প্রতিমার তৃতীয় নেত্রের অধিকারী যে পূর্ণমাত্রায় ছিলেন তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। অমদাপ ঐ মাতালের নেশার প্রয়োজন হয়নি।
তাহলে নেশা কেন? দিব্য নজরটির, তৃতীয় চোখের খোঁজ, আর আবশ্যকতা সম্পর্কে র‍্যাঁবো থেকে গিনসবার্গ-তুষার এবং নাম না জানা এ পথের বহু যাত্রীর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না, সেই কথাটাই শুধু প্রামাণ্য করে তোলে নেশার হাত ধরার এই চেষ্টা। [ নেশার ভাল-মন্দ বা উচিত অনুচিতের প্রশ্ন নয় এটা। কল্পনার তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কবির অনায়াস সন্তরণ ও নেশাগ্রস্তের খাবিখাওয়া, তার অকালমৃত্যুর আমরা তো প্রত্যক্ষদর্শী। ] নেশা এখানে ওই দৃষ্টির জন্য আকুতি বিশেষ। অন্য কেউ যা পেতে চেষ্টা করেছেন আত্মপ্রহারে। ভবঘুরে, সমাজবিরোধী হয়েছেন কেউ। নিথর সত্য দেখতে পেলেন ভিখিরি হওয়ার পর। প্রাচ্যের এক কবি বলতে পারেন, আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়…

**রেখা সান্যাল, মল্লিনাথ প্রমুখ**

কল্পনা করুন মিস রেখা সান্যাল ও মল্লিনাথ বাস্তব চরিত্র। এবং তাঁরা এই অকিঞ্চিৎকর লেখাটির খড়কুটো হওয়া অপেক্ষা হাই তোলাকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন। সেই কথাটি আমাকে খুব কর্কশভাবে জানালেনও তাঁরা, দোহাই দিলেন স্বাধীনতার, 'তোমার যা ইচ্ছে লেখ, আমাদের টানছ কেন।' মল্লিনাথ তো পারলে খুন করে ফেলে :
'লেখা-ব্যাধি তোর, সুতরাং নিজে মর, আমার ঠ্যাংটি ছেড়ে দাও বাপ। নিজের নামে বলা/লেখা সাহসে কুলোচ্ছে না…' এবং খুব কাঁচা খিস্তি করল মা-মাসি তুলে। এতে আমি যত না চটেছিলাম তার থেকে বেশি মুষড়ে পড়ি এই ভেবে, মল্লিনাথ আমাকে এত ঘৃণা করে জেনে। ভালবাসা-ঘৃণা চক্র কি সত্য তাহলে? সামান্য একটা লেখা যা ২০/২৫ জন পড়বেন কিনা সন্দেহ। পড়ার পর ২/৩ জনেরও মনে থাকবে না, যা হারিয়ে যেতে ৬ মাসও লাগবে না, এমন একটি কাগজ-নৌকা। মল্লিনাথ ও রেখা আক্রমণ করেন গত ২৩ ফেব্রুয়ারি। আজ ২৫ তারিখে কলম ধরেছি তার বিবরণ

লেখার জন্য নয়। আমাদের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে— এ নিয়ে কোনও মন্তব্যও লিখে রাখতে চাই না। আবার কপি করা, নতুন করে লেখার মতো মনের জোর ও ইচ্ছে কোনোটাই নেই। তাই একটি পাঠনির্দেশ দিয়ে রাখছি : যে সমস্ত সংলাপ অংশ এবং অন্যত্র মল্লিনাথ ও ম আছে সে সবই ভূত ও ভূ পড়তে হবে। রেখা সান্যাল স্থলে পড়বেন বৃত্ত রায় ( সারনেম নয়— কোর্টের রায় অর্থাৎ গোল্লাই সত্য এই রায় )।

মল্লিনাথই যখন নেই এবং রচনামাত্রের একটা নাম থাকা নিয়ম/রীতি বলে নামের সাইনবোর্ডটিও পাল্টানো দরকার, পাঠকের প্রতি অনুরোধ যা হোক একটা নাম বসিয়ে নেবেন, আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে 'নিবোধের শিল্পশাস্ত্র' মন্দ হবে না।

**বালুকারাশি**

বা, বালির রাশি। কে কবে এমন রাশি দেখেছে স্বপ্ন ছাড়া। বাস্তবে এ দুইই আছে, বালি এবং রাশি ; যেমন আছে নর এবং সিংহ কিন্তু নরসিংহ নেই। জল থাকলেও পরী নেই, রূপকথার জাদুঘরটি সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারের অন্তর্গত বলেই তবু জলপরী, মৎস্যকন্যা, নরসিংহরা আছে। এ এক সিনথেসিস, ফ্যানটাসি বলে চিহ্নিত, যার জন্ম কল্পনার হিস্টেরিয়ায়। সমান্তরাল এক জীবন ও জগতের এই শিল্পভাষা সাহিত্যের একচেটে নয়। সাহিত্যভাষা মানস চিত্রকল্প, ক্যানভাসে তার প্রকাশ, তাকে রূপ দেওয়া নব্বইভাগ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। এ তার নিজস্বতা, এখানেই তার মৌলিকত্বের বীজ। বালুকারাশির কোনও চিত্র হয় না, শুধু মানসপটেই এ নিজেকে মেলে ধরতে পারে। অন্যথায় বালি পড়ে থাকবে শুধু কিংবা বালি রঙের একটি দড়ি দেখতে পাব আমরা। কণাগঠিত বস্তু যখন দেখি তখন কণাগুলি চলে যায় দৃষ্টির আড়ালে, এখানে, বালুকারাশি শব্দে, এই মানসচিত্রকল্পে কিন্তু তা হচ্ছে না, উভয়ের কেউই তৃতীয়কে গড়তে গিয়ে আত্মবিলোপ ঘটায়নি। মজা হচ্ছে এই শব্দ সৃষ্টির পিছনে কিন্তু এত যুক্তি, এত বিচার ছিল না— এ এক উন্মাদ কল্পনা মাত্র।

এই শব্দযুগলের স্রষ্টা লেখক হয়তো একে আজগুবি বলে মানতেই চাইবেন না। উল্টে এই গোত্রের আরো অজস্র শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চাইবেন ভিন দেশের ভাষা তার আচার, আচরণ যেমন স্বতন্ত্র, আপনার অজ্ঞাত অথচ অনুশীলনে চর্চায় আপনি শিখে নিতে পারেন, সাহিত্য তেমনই এক ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জীবন, সেখানে এসব শব্দ, চিত্রকল্প, ধ্বনি, যতি, শুধুতা শুধু ভাষা নয় জীবনও, একে ভাষাজীবন, ভাষাশরীরও বলতে পারি আমরা।

ঐ লেখককে আমরা জেরা করে চললে একসময় তিনি গোপন কথাটি ফাঁস করে দেবেন : বাস্তবের স্মৃতি এর উৎস, আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি, সেই স্মৃতি থেকে লেখা :

স্মৃতি শব্দটিকে আলাদা করে রাখা যাক। বাস্তব-ও থাক একটু তফাতে।

অভিজ্ঞতা শব্দটিকেও বেশ সন্দেহের চোখে দেখা দরকার। ক্রমানুসারে বাস্তব প্রথম— দ্রষ্টা ও দৃশ্য দুই-ই বাস্তব। কিন্তু স্মৃতি আর অভিজ্ঞতার পরম্পরা নিয়ে এক বিভ্রাটে জড়িয়ে যাই।

এখানে 'ব্যক্তি' মহাশয়টি আর এক ফাঁদ পেতে রেখেছেন। ব্যক্তির স্মৃতি, ব্যক্তির অভিজ্ঞতা তো শুধু নয়, তা প্রকাশ করায় পাল্লা আবার বেশি ঝুঁকে যাচ্ছে ব্যক্তিগত ভাষার দিকেও।

ক্রিয়া-কর্ম-অনুভূতি এক কুঠারিতে বদ্ধ আছে যেন, সেসব অতীতের স্মারক হয়েছে এখন। অভিজ্ঞতারই রূপান্তর ভাবাটা ঠিক হবে না, কারণ জারিত হওয়াটাও সম্ভবত অভিজ্ঞতারই এক পর্দা, পর্ব। স্মৃতিকে অভিজ্ঞতা থেকে এবং অভিজ্ঞতাকে স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করব কী করে। ধুকধুক স্পন্দনের, জীবনের, শুরুর দিন থেকে সে সঙ্গী। স্মৃতির অভিজ্ঞতাও আছে আমাদের— যেজন্য মাও সে তুঙ কথিত সাদা পাতা আমরা কখনওই নই। ফলে ছবি আঁকতে গেলে কিঞ্চিৎ জটিলতা অনিবার্য। যেসব আঁকিবুঁকি বয়ে বেড়াই তার কিছু যৌথের, যৌথ নিশ্চেতনার, কিছু ব্যক্তিগতও।

গোয়েন্দা বুলাও, ব্যক্তিগত মালটির ঢাকনা খোলা হোক, পাউডার ছড়িয়ে পায়ের ছাপ, হাতের ছাপ নেওয়া হোক।

নিত্য ব্যবহার্য, কাজকামের ভাষা, কেতাবের ভাষা, কেতার ভাষা, বিজ্ঞাপন ও গালমন্দের ভাষা, ভাষা ভাঙা শব্দ, শব্দের অক্ষর, প্রত্যয়, বিভক্তি— এবং আরও ভাঙতে-ভাঙতে ধ্বনিতে সুরে পৌঁছে যাওয়াটা অসম্ভব নয় কিন্তু অর্থ সংযোজন, সেটা কী ভাবে সম্ভব? এই ভাঙাগড়ায় যা সৃষ্ট হচ্ছে সেই মুখটির একদিক আলোকিত অন্যদিকটি রয়েছে অন্ধকারে। টেক্সটের এই আলোকিত দিকটি যদি হয় স্বচ্ছ সৃজনশীল অংশ তা হলে যা রয়ে গেল অন্ধকারে সেই অংশটি নিশ্চিত দুর্বোধ্য। এবং দুটি ভাগেরই পুষ্টির পিছনে অন্য অনেককিছুর সঙ্গে রয়ে গিয়েছে এক গ্রন্থপঞ্জী। রচনার মুহূর্তেও সম্পাদনার কাজ কিছু থাকে: প্রকাশ ও অপ্রকাশের মধ্যে থাকে একটা লেনদেন। অব্যক্ত বলে যাকে আমরা এতদিন চিহ্নিত করে এসেছি সে যে পাঠের অন্তর্গত হচ্ছে এটা এখন স্বচ্ছ হল যুক্তির দিক থেকে, কিন্তু প্রক্রিয়াটি বোঝা গেল না।

প্রকাশ ও অব্যক্তের এই টানাপোড়েনে বাস্তবের একটা রূপান্তর ঘটছে দেখি। বাস্তব হয়ে উঠছে শিল্প বাস্তব। এই অবধি তেমন মাথাব্যথা কিছু নেই, বিপদের থাবা ঝলসে উঠছে ঠিক এর পরেই: কী ভাবে ঘটে এই রূপান্তর, এই নবজন্ম।

বাস্তবের শিল্প বাস্তব হওয়ার পর্বগুলি লক্ষ করা যাক:

বাস্তব
↓
ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে আগত বাস্তব
↓
স্বপ্ন বাস্তব
↓
শিল্প মাধ্যমে গৃহীত/স্থান করে নেওয়া স্বপ্ন বাস্তব (সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষাই শিল্প মাধ্যম)
↓
শিল্প বাস্তব

ব্যক্তিগত ভাষাই শিল্পভাষা, ব্যক্তিগত উপাদান ভাষাকে মাধ্যমের অতিরিক্ত কিছু করে তোলে, সৌন্দর্য সৃষ্টির এটিই প্রধান উৎস। এর আগে আমরা যে উদ্বৃত্তের কথা বলেছি তারও গর্ভ এই ব্যক্তিগত ভাষা। যা স্বপ্ন ও বাস্তব, যা কল্পনা ও জ্ঞান, যা অভিজ্ঞতা ও অনুভব। একটি বাক্যে এর স্বরূপ হল : জগৎচিত্রের ভাষাচিত্র হয়ে ওঠা। এই কাণ্ডটি যখন ঘটছে বস্তু জগতের ত্রিমাত্রা, তার আকার, আয়তন, স্পর্শ, গন্ধ সমস্তই ভিনদেশের নাগরিকত্ব নিচ্ছে, সেইটি ভাষা দেশ। যে দেশকে আমরা সমান্তরাল জগৎ ও জীবন হিসাবেই চিনেছি। কিন্তু এই দেশ আরশিনগর নয়। বরং ককতোর সেই কুহক আয়না এটি যার মধ্য দিয়ে লাসাময়ী মৃত্যুদেবী অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে শুধু নয় কবির হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে, দেখিয়ে দিতে পারে, দুর্বোধ্য অথচ স্বচ্ছ দৃশ্যাবলী। দুর্বোধ্যের কারণেই স্বচ্ছ অতখানি স্ফটিক এবং উল্টো দিক থেকে স্বচ্ছতাই দুর্বোধ্যকে করে তুলছে অতখানি কুহকধর্মী, অনন্ত অর্থের ভাণ্ডার।

**ব্যক্তিগত = নৈরাজ্য**

এইখানে, ভুলে যাওয়ার আগে বা পাছে ভুলে যাই ( কারণ শুধু তো স্মৃতি নয় আছে বিস্মৃতিও ) সেই ভয়ে বলে রাখি, স্বচ্ছ সৃজনশীল ও দুর্বোধ্য কিন্তু টেক্সটে কখনো দুটি পৃথক খণ্ড হিসাবে উপস্থিত নয়, তারা আছে পরস্পরের সঙ্গে মিশে, দুই তন্তুর বুনন যেমন। এ ওর উপর আলো ফেলছে।

ভাষায় একটা নৈরাজ্য সংঘটনের দরুনই এমনটা হচ্ছে। সাধারণভাবে যে সাঙ্কেতিকতা ভাষা ধারণ করে তার ব্যবহার ও প্রচলিত নিয়মকানুন, সেসবের পুরনো অভ্যাস ইত্যাদিতে ঝরে যায় সাঙ্কেতিকতার পালকসমূহ। পাখির বাসা কাকের বাসা, তা নীড় নয়। কিন্তু পাখির নীড়ের মতো হলে 'র'-এর পুনরাবৃত্তিতে ধ্বনিমাত্রা এসে পড়ে, একটা অভিঘাত— এতে যা বলা হচ্ছে তাতে আশ্রয়-উষ্ণতা-আতিথ্য যেমন আছে তেমনি রয়ে গেছে উড়ান তথা গতিও— কেননা নীড় কুলায় নয় শুধু, সে রথের আসনও বটে। কখনো-বা শব্দ গুপ্তও রেখে দেওয়া হয়। পায়ে ধরে সেধেও রাধা রা না দিলে এবং পাগোল পা ছেড়ে দিলে পাই ধারাগোল। সাঙ্কেতিক লিপি যেন। [ এই হেঁয়ালিটি খুব সরল ও গড়পড়তা নজির হল সন্দেহ নেই তবে সাঙ্কেতিকতার দিকটি স্পষ্ট করতে এর জুড়ি মেলা ভার। ] ব্যক্তিগত ভাষায় ভাবতে গিয়ে কত কবি শব্দের রঙ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন, রঙ-বাচক শব্দে খুঁজে পেয়েছেন বিভিন্ন মাত্রার ঊষ্ণতা।

সাঙ্কেতিক ভাষায় রচিত এই ভিন জগতের কিছু আন্দাজ, কিছু উপকরণ আমরা জীবনানন্দের রচনায় সামান্য খুঁজলেই পেয়ে যাই, তারই কিছু খণ্ড দৃশ্য দেখব এবার। তার আগে বলে নিই, থার্ড থিয়েটারে যেমন কিছু অনুভব কিছু ধারণাকে ইম্প্রোভাইজ করার চেষ্টা থাকে, উদ্ধৃত অংশগুলিতেও আমরা দেখব সেরকমই একটি ধারণা ও অনুভূতিকে ইম্প্রোভাইজ করা হচ্ছে। আর তার নাম : ভালবাসা।

খণ্ড দৃশ্য : এক

'সত্যব্রতের নিজের জীবনেও এরকম প্রেমানুভূতা এসেছিল নাকি ? এরকম ? না, কোনোদিন এ জিনিশ পায়নি সে। ঘুরেফিরে কতকগুলো ভালবাসার গানেরই রেকর্ডের ফাঁকে মাধুরীকে দিনরাত্রির যে কোনো অবান্তর সময়েই আটকে ফেলে উপভোগ করতে পারে বলে বিনয়েশের বিশুদ্ধতার আর শেষ নেই।'

খণ্ড দৃশ্য : দুই

'জ্ঞানবাবুদের বাংলোতে সময়ে অসময়ে গ্রামোফোন বেজে চলে··· দিন-রাত্রির বিশেষ বিশেষ সময়ে বাছা বাছা রেকর্ডগুলো চড়িয়ে দিচ্ছে বিনয়েশ। বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। এমনই রেকর্ড পছন্দ করে নাকি সে, একাই সে নাকি শ্রোতা ?··· নিজের মুখে রেকর্ড বেজে উঠতেই মাধুরী তার পড়ার ঘর থেকে নেমে আসছে। একেবারে দক্ষিণের বারান্দার দিকে চলে যাচ্ছে, বেতের চেয়ারটা টেনে, চশমাটা আঁচলে মুছে নিয়ে ভাল করে এঁটে, শুনছে। শুনছে সে, দেখছেও বটে, চশমা পরিষ্কার করার আবশ্যকতা ছিল তার'।

[ মুখে রেকর্ড বাজে, গান দেখা যায়— এসব ঘটে সময়ে অসময়েও— বিশেষ বিশেষ সময়ে। ]

খণ্ড দৃশ্য : তিন

'বিনয়েশের রেকর্ডে, ভোরে, দুপুরে, জ্যোৎস্নারাতে নক্ষত্রের সমারোহের ভেতর মাধুরীর প্রেমপ্রবণতা চরিতার্থ হচ্ছে শুধু, খুব গভীরভাবেই, কিন্তু এইটুকুর বেশি আর কিছুই নয়, বিনয়েশ ওর লক্ষ্য নয়, বিনয় যদি না থাকত, তার রেকর্ডগুলো থাকলেই যেন হয়, তারপর এই নক্ষত্র রয়েছে। অন্ধকার রয়েছে। শরের বন, বাবলার বনজঙ্গল, আউশ ধানের অনন্ত বিস্তৃত খেতপারের নীচে, নিজেকে নিজে নিয়ে বসে রইবার একটা অভঙ্গ অবসর এই সবই ত রয়েছে।'

খণ্ড দৃশ্য : চার

"সত্যব্রত বললে, 'তুমিই শুধু নয় মাধুরী, আমাদের পরিবারও শুধু নয়, অনেকেই এ পারে না, এই যে আমি এত বড়াই করছি, তোমার চেয়ে এত বেশি বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা পেয়েও কিছুতেই পারলাম না আমি, আমিও। কিন্তু এ পারা উচিত মাধুরী, পারা উচিত, পারা উচিত, এ সাধ ছাড়া এ সংকল্প সাহসকে বাদ দিয়ে এই সাহস ও আবেগে অর্জিত প্রেমকে জীবনে না পেয়ে আমাদের জীবনের কি মানে থাকছে ? কি প্রয়োজন ?'"

খণ্ড দৃশ্য : পাঁচ

'মাধুরীকে শীতাংশুর এ ভালবাসা, এ অনেকদিন ধরে, যুবকটি এ মেয়েটির জন্যই এই চার বছর ধরে পৃথিবীটাকে বিধাতার, অন্তত ভাগ্যবিধাতার সোনাফসলের ভাঁড়ার বলে

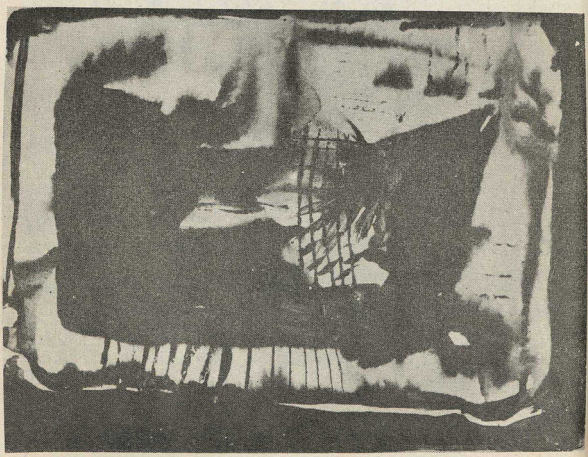

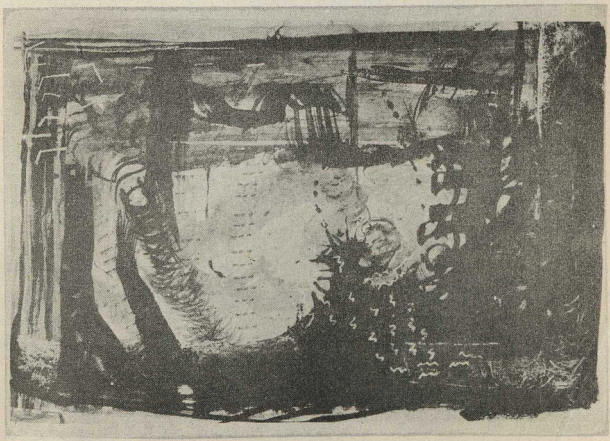

বুঝতে একবার নিরর্থক বিধাতাশূন্য মানবাত্মার গভীর সংগ্রাম সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার প্রদেশ বলে মনে করছে আর একবার। এসব কোনো কিছুর ভিতরেই কোনো শান্তি নেই, শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভস্ম।'

( শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালবাসা : জীবনানন্দ দাশ )

ভাষার বহিরঙ্গে এখানে সর্ষে পরিমাণ দুর্বোধ্যতাও নেই। পরিচিত, সহজ সব শব্দ আত্মীয়বন্ধনে রয়েছে আর তাতে একটি গল্প ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে ক্যানভাসে। কিন্তু এত করেও বাস্তবের এমন এক প্রান্তিক এলাকা রচনাটির ভূমি, যে হয় আমরা একে বিলাস বা একপ্রকার অস্পষ্ট আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা বলে মনে করব, না হলে সবটাই কেমন ছায়াছায়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলেই মনে হবে। মাটির বেশ কিছুটা উপরে রয়েছে যেন, 'রিয়েল' নয়। চরিত্ররা কেউ স্পষ্ট নয় চিন্তা ও অনুভবে, তুলোর পুতুল যেন, টেক্সটে তা বলাও হয়েছে। দুনিয়াদারি এখানে নেই, সেই সময়, দেশও।

'এ শিহরণ ব্যথারও বটে, কিন্তু তবুও কি যে মধুরতার। মাধুরীও পৃথিবীর এই সমস্ত সমাবেশের ভিতরেই বসে রয়েছে সত্যব্রতের কাছে। কিন্তু তবুও এ ছবি মানুষের জীবনের অনুভব পরস্পরের চেয়ে কত দূর দূরান্তে— অনুভূতির লোকে এরা কেউ কারু মুখও চেনে না যেন।' এত বেশি 'তবু' ও 'কিন্তু' জীবনানন্দের খুব কম রচনাতেই আছে— এরা এক বিচ্ছিন্নতা এক অসহায়তা ও আর্তির কথা জানাতেই উন্মুখ— অথচ তাকে জানা ও জানানো দুইই অসম্ভবের নামান্তর। অব্যক্ত সে, চার বা দু অক্ষরের ভালবাসা/প্রেম।'

তার রূপ ও প্রতিটি তন্তু সন্ধান/উপলব্ধির প্রয়াস গল্প নামক এই রচনাটির ভাষা তাই অন্দরমহলে গভীরভাবে দুর্বোধ্য, সাঙ্কেতিক, ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত বলেই দুর্বোধ্য। ব্যক্তিগত ভাষায় রচিত শিল্পকর্মটি ত্বকের নিচের আলোর মতো। এ এক গোপন আলো, যা লুকিয়ে রাখে বহু অর্থ, সাঙ্কেতিকতার মোড়কে। সমগ্র রচনাটি ভালবাসার গানের এক পুরনো রেকর্ড যা সময় উজিয়ে বেঁচে আছে, যা যুগপৎ প্রাচীন ও আধুনিক। মাধুরী, সত্যব্রত ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমরাও গীতটি শুনি। চরিত্ররা গানের মাঝে মাঝে দু-একটা মন্তব্য করে ফেলে, নড়েচড়ে 'যেমন আমরাও কেশে ফেলি, জল খাই, বা গানের একেকটা জায়গায় বাহবা দিয়ে উঠি। এই প্রক্রিয়ায় রচনাটি আর ফ্রেমের মধ্যে বন্দি থাকে না। সে জিনসের প্যান্টের পকেটের ছোট্ট টেপরেকর্ডারে গানটি চালিয়ে দিয়ে, দু কানে প্লাগ গুঁজে পেরিয়ে যায় ভিড়ের রাস্তা, চৌরঙ্গি, শিয়ালদা, লাফিয়ে উঠে পড়ে বাসে, দ্বৈতজীবনের এক নাগরিক সে। শিল্পের প্রান্তিক জীবন তাকেও মায়াময় করে তোলে, 'ঐ যুবকটি কি রিয়েল ?' এই প্রশ্নও উঠে আসতে চায়— আর স্বপ্ন তখন বাস্তব। স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা স্মৃতি নিঃসৃত গীত হয়ে যাওয়ার পর একটা নোঙর পাওয়া গেল— যুক্তির রাজ্য অতদূর বিস্তৃত নয়। গানটি উঠে আসছে বহুদূরের সমান্তরাল জীবনের সেই ক্ষমাপ্রদেশ থেকে। আমরা বরং এখন আহ স্মরণ করি, স্পর্শ করি ঐ উন্মাদগীত···

[ ঐ গীতটি সবাই শুনছেন, শুনবেনও, আমার এই রচনাথাতে আর আয়ুদহনের কোনো কারণ দেখি না। শুধু একটা কথা বলা জরুরি মনে করছি। অ্যাকাডেমিক্সের লোকজন যে কোনো রচনা লিখলে তার শেষে জানিয়ে দেন কার-কার সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছেন। এ ব্যাপারে একেকটি গোষ্ঠীর একেকটি নাম-তালিকা থাকে। রামা যদি শ্যামার বইয়ের উল্লেখ করেন তাহলে শ্যামাও তাঁর নিবন্ধে রামার বইয়ের উল্লেখ করবেন। এইভাবে কয়েকটি নামই শুধু ঘুরেফিরে সার্কুলেটেড হয়। আমার এই সামান্য রচনাটি অনেকের ঋণের এক অপব্যবহার বিশেষ। কিন্তু তাঁদের নাম উল্লেখ করব না এজন্য যে তাঁরা কেউই বেঁচে নেই। এ কেমন কারণ! খুব সোজা, ওঁরা তো আর আমায় নামটি ওঁদের রচনার শেষে দেবেন না সুতরাং আমিই-বা কেন দেব। কেউ যদি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন সেটা তাঁর ব্যাপার। যদিও ঠগ খুঁজতে গাঁ উজাড় হবে, শেষে দেখা যাবে এই রচনাটির একটি শব্দও আমি লিখিনি। আমাকে ধরুন চোর ঠাওরানো হল। তা হোক, কেননা আমরা তো জানি গীতের সেই কলিটিও :

কেকরা কেকরা নাম বাতাঁউ
জগমে সব হি চোর ]

কিছু নিজস্ব মুদ্রা, খাপছাড়া আচরণ, উদ্ভট অভ্যাস ছাড়া ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য আর কীই-বা, এমনকি এইসব উদ্ভটত্ব ও বিচিত্র অভ্যাসও হুবহু এক এরকম বেশ কিছু ব্যক্তির দেখা মেলাও অসম্ভব নয়। যেমন ঠোঙা ও টুকরো কাগজ পড়া আমার পঞ্চাশ-ষাট বছরের অভ্যাস, সিরাজদ্দাকেও দেখেছি ঠোঙা পেলেই পড়তে। কিন্তু আমি এই অভ্যাসটির দরুন লেখালিখির ব্যাপারে যেভাবে উপকৃত হয়েছি আর কেউ তেমনটা হয়েছেন কিনা জানা নেই। ঠোঙায় পর্নোগ্রাফির পৃষ্ঠাও পেয়েছি কখনো কখনো প্রেমপত্রের মতো, সেই পুলক ভোলাবার নয়। এখানে ঠোঙা প্রসঙ্গ অবতারণার উদ্দেশ্য এই রচনাটিকে ঠোঙা বানানো নয়, যদিও সেটাই এইসব দাগ ও আঁচড়ের অনিবার্য ভবিষ্যত।

আসলে রচনাটি যখন শেষ হল, বা আমার লেখার শক্তি ও ইচ্ছে দুটোই ফুরিয়ে যাওয়ার দিন বারো পরে ৩০ মার্চ একটি ঠোঙা আমার হাতের চেটোয় পাখির মতো উড়ে এসে বসল। মিরাকল্ আর কাকে বলে! আরো আশ্চর্য, সেই ঠোঙায় 'অনাথ তত্ত্ব' শীর্ষক একটি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে আবার তা সরাসরি না বলে চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে এসেছে। তো ঐটি পড়ে আমি নির্মল আনন্দ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বিবেকদংশন, আমার দীর্ঘ লেখাটি পড়ে কোনও পাঠকই এর ছিটে ফোঁটাও পাবেন না। খারাপ লাগছিল, কষ্ট হচ্ছিল, তখনই মনে হল ছাপার কাজ তো শেষ হয়নি, পরিশিষ্ট, সংযোজন, বা ঠোঙা— জাতীয় একটা সাব-হেড দিয়ে জুড়ে দিলে কেমন হয়। বা, অনাথ তত্ত্ব নামেও ছাপা যেতে পারে।

এটা করতে গিয়ে যেহেতু ঠোঙা ঋণ কবুল করে ফেলছি তাই আর ছেনালি না করে বাদবাকি কর্জ কবুল করে একটি গ্রন্থসূত্রও দেওয়া হল।

**ঠোঙা / ১**

তাহার নাম অনাথবন্ধু কিন্তু উচ্চারণ মুহূর্তে সে শব্দটির আধখানা প্রকাশ করিয়া প্রতিবার দম লইত, ফলে তাহা শ্রোতার কানে ধরা দিত দুইটি অংশে : অনাথ বন্ধু। যেন-বা প্রথম অংশটি তাহার নাম আর শেষটুকু দাস-ঘোষ-মিত্র মার্কা পদবী। চমৎকার একটি সেকুলার ব্যবস্থা সন্দেহ নাই।

অনাথ বন্ধু কদাপি নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা পছন্দ করেন নাই, এবং··· একখানি আস্ত জীবনের মনিব হওয়ার ঝকমারি যে কতদূর অনাথ বন্ধু তাহারই এক জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত।

মানুষের সাজসজ্জা ও পারিপাট্য তাহার হৃদয়ের, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতকে গোপন করিতে পারে না। অনাথ গলপচ্ছলে বহু তালেবর লোকের এমন সব ঘটনার কথা বলিয়া থাকে শুনিলে তাজ্জব বনা ছাড়া উপায় থাকে না। কাউকে দেখিয়াছে হঠাৎ সঙ্কটে প্যান্টুলুন হলুদ করিতে, কারও নাকি ঘুমের মধ্যে দুই কষ বাহিয়া লাল গড়ায়, দোর্দণ্ডপ্রতাপ একজনকে স্ত্রীর ধমকে ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে পর্যন্ত দেখিয়াছে।

সভ্যতা শব্দটি ও তাহার নানান রূপের মোড়কে আমরা যে অনাথ সেইটি গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। যত বেশি যন্ত্র গড়িয়াছি, ততই আপনকার বিপন্নতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গোরুর বাচ্চা তাহার মা-এর পেট হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র লাফাইতে থাকে আর মানুষের বাচ্চার শুধু হাঁটাটুকু শিখিতে লাগে দুইটি বৎসর। শারীরিক দুর্বলতার ঘাটতি মিটাইতে লিভার, হাতল, কপিকল ইত্যাদির উদ্ভাবন, যদিও শেষপর্যন্ত আমরা ইঁদুরবৎ ধরা দিতেছি ঐ সব কলে। সমস্ত কল ও যন্ত্রাদি সরাইয়া লউন, তারপর নিজেকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করুন, আপনার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুর পরিবর্তে রক্ত বাহিবে, একমাত্র তখনই উপলব্ধি করিবেন দীনদুনিয়া শব্দটির তাৎপর্য।

ঠোঙা নামক হস্তশিল্পের নিদর্শনটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত, অতএব বুঝতে পারছেন এটি পাঠ্যবস্তু হিসাবে টুকরো-টাকরা, অংশ, খণ্ডিত। যতদূর উদ্ধৃত করা হল ঠোঙার একটি পিঠ এখানেই শেষ এবং অপরপিঠ কন্টিনিউয়েশন হলেও মাঝে অনেকটা ফাঁক আছে, ঐ ফাঁক কল্পনা দিয়ে পূরণ করতে হবে।

**ঠোঙা / ২**

'অনাথবন্ধু' পাকেচক্রে এই নামপদ সমেত সে প্রায় একটি জীবন্ত দর্শন হইয়া উঠিয়াছিল, যেমত কমিউনিস্ট, ফেমিনিস্ট ইত্যাদি হইয়া থাকে। অনাথ বন্ধু একখানি কেতাব লিখিবে সংকল্প করিয়াছিল বটে কিন্তু এই কাজে সে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার বিবেচনায় বৃক্ষসকলের মতো নয় বলিয়া, শিকড় নাই বলিয়াও মানুষ অনাথ ভাসমান। যেজন্য কোনো তত্ত্ব, চিন্তা ও দর্শন সে দীর্ঘদিন আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে না। এই অন্ধ পরিব্রাজক কোথায় যাইতেছে তাহা উত্তমরূপে জানে না, কখন মোড় ঘুরিবে তাহাও জানে না অথচ তাহার অগ্রগমনের শেষ নাই। ফলতঃ যাহা সে আজ ভাবিতেছে কল্য তাহা নস্যাৎ করা ভিন্ন ইহার কিছুই করার নাই। কালরূপ অগ্নিতে নিজেকে, নিজের সৃষ্টিকে ক্রমাগত নিক্ষেপ করাই এই শিশুর ধর্ম

ঠোঙা শেষ, মানে ঠোঙার কথা আর কিছু নেই। কিন্তু এই দুটি অংশ সংযোজনের পর বেশ ভয় লাগছে, বিপন্ন বোধ করছি। যুক্তি সংস্কার সর্বাত্মক, সর্বগ্রাসী বলে নিশ্চয়ই তর্জনী তোলা হবে কেন বেহুদা এইসব (কায়দাবাজি) করা। সত্যিই তো এসব করতে গেলাম কেন এই প্রশ্নে আমিও বিব্রত এই মুহূর্তে। সে কি এইজন্য যে, আমরা দীনের দুনিয়াকে ভেঙে গড়ে চলেছি নিয়ত, আমাদের চিন্তা শুধুই ভাঙা-গড়া আর এই মাদারি খেলে শিশু সদৃশ আমরা যে বিমল আনন্দ উপভোগ করি সে শুধু এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের নিহিত বিমূর্ততার জন্য, কেবলই অধরা, অসীমের টান···

কবির নিজস্ব ডিকশন, তার ভাষার ব্যক্তিগত ধর্ম কি রচনাটিকে অনাথ করে না? ইতিহাসের বাইরে ঠেলে দেয় না? বা এই প্রক্রিয়া অনাথের পিতা-অন্বেষণ হিসাবেও গণ্য হতে পারে। পূর্ববর্তী সমস্ত লেখকদের ভিড়ে এক তরুণ লেখক তাঁর পিতাকে খুঁজে চলেছেন, পিতাকে সৃষ্টি করে বলেছেন। ঐতিহ্যের এ ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ নেই। ঠোঙার 'অনাথ' শব্দটি একটি চাবি বিশেষ যা দিয়ে অনেক তালাই খুলে ফেলা সম্ভব। □

**গ্রন্থসূত্র :**

ক. ফাকিং কনশাসনেস অ্যান্ড হিস্টোরিয়া অফ ইমাজিনেশন : জে স্পিভাক অ্যান্ড ইসাবেলা টিউডর, অক্সফোর্ড, ১৯৯০।

খ. আউলিয়া মন : ড. মিতা সেন, পত্র প্রকাশনী, ১৯৪১।

গ. হাউ স্মল ইউ আর : জেনেথ অ্যান্ডারসন, পিকাডোর, ১৯৮৬।

ঘ. কাফকা পেপার্স : এডিটেড বাই ম্যাক্সিমাম ব্রড, আলফা, ১৯৭৯।

ঙ. রিলকে অ্যান্ড হোমোসেক্সুয়ালিটি : জাঁ পল জেনে, গ্যালিমার, ১৯৬৯

চ. রিপোর্ট অন নেটিভ প্লেস ১৯০০-১৯০২।

ছ. হাউ উই ডাই : শেরউইন বি নুল্যান্ড, ছাটো, ১৯৯৫।

জ. দ্য মর‍্যাল অ্যানিমাল : রবার্ট রাইট, সেভেন সিজ, ১৯৯৪।